বাংলা নববর্ষ ঃ একটি অবিশেষজ্ঞীয় বিশ্লেষণ

মেজবাহউদ্দিন জওহের

আজ থেকে সাইত্রিশ ছত্রিশ বছর আগের কথা।
উনসত্তরের এপ্রিল মাস।
স্থান- পাঞ্জাবের হাজারা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম, নাম হরিপুর।
বড় সুন্দর জায়গা হরিপুর। পাইন, ওক, দেবদারু আর কমলালেবু বৃক্ষের শাড়ীজড়ানো অপরূপ তনুদেহ। বাশিন্দাদের শতকরা একশ' ভাগ মুসলমান। তাও আবার যেই সেই মুসলমান না। মোল্লা ওমরের জ্ঞাতিগোষ্ঠি খাটি পাঠান গোত্রীয় মুসলমান। পাশের গ্রামটির নাম রেহানা, পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খানের গ্রামের বাড়ী। হোস্টেলের রুমে বসে সেই সময়ের কিংবদন্তী পুরুষটির বাপ-দাদার ভিটার গর্বিত চূড়া দেখা যায়। এমন একটি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের নাম কীভাবে হরি'র নামে রাখা হয়েছিল, সে এক প্রশ্ন। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন- নামটি এখনও টিকে আছে। তালেবানি বিপ্লবের এতবড় ঢেউয়েও ধুয়ে মুছে যায়নি, দু' হাজার ছয় সালেও তা হরিপুরই আছে! খত্না করে নবীনগর কিংবা সাদুল্লাপুর করা হয়নি। এ থেকে কি এটাই প্রমান হয় না যে- আমরা বাঙালিরা পাঠানদের চেয়েও বড় মুসলমান? আবহমান কাল থেকেই আমার গ্রামের নামটি ছিল দুর্গাপুর, এমনকি পাকিস্তান আমলেও নামটি সগর্বে টিকে ছিল। বাংলাদেশ কায়েম করার পর গ্রামের নব্য বাঙালি মুসলমানদের মনে হলো- মা দুগ্যার নামে গায়ের নাম হবে? ছিঃ! সুতরাং নাম পাল্টিয়ে নবীনগর করা হলো। আরও গর্বের কথা এই যে আমার পাশের গ্রামটির নামই পিরুজালি, যেখানকার মাদ্রাসায় একদা লেখাপড়া করে গেছেন বাংলার ইসলামী বিপ্লবের সিপাহসালার স্বনামধন্য শায়খ আব্দুর রহমান।

বন্ধু মুছিবুদ্দৌলা এসে বলল- 'অসময়ে রুমে বইসা আছস্ ক্যান্। চল্, মেলা দেইখা আসি'।
মুছিবুদ্দৌলা সাধারণ্যে মছিবত নামে মশহুর। নামের সাথে আচরণের এক শ' আশি ডিগ্রি ফারাক মছিবতের। কারও মছিবত ঘটানো দুরের কথা, সে পাশে থাকতে কেউ মুখ ভার করে থাকবে সেটি হওয়ার জো নেই। হাসিয়ে কাঁদিয়ে অস্থির করে রাখবে সারাক্ষন। এমন একটা ছেলের নাম বাপ-মা'য়ে কেন যে মছিবত রাখল- সেটাও আরেক প্রশ্ন। কোন একজন বাপমা যে তাদের অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন রেখেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই আর।
বললাম- 'মেলা! কোথায় মেলা, কীসের মেলা, কার মেলা'?
- 'বৈশাখের পয়লা তারিখে আমাগো দ্যাশের মত এখানেও মেলা বসে। নাম জশ্নে হাজারা। জমজমাট মেলা। সার্কাস পার্টি আইছে, পাঠানি মাইয়ারা পশমি চাদর নিয়া দোকান সাজাইয়া বসছে। খুউব সস্তা'।
মছিবতের কথা শুনে আরেকটি প্রশ্ন মাথায় ভর করে বসল এবার। পয়লা বৈশাখকে বাংলা সন বলে জেনে এসেছি এতকাল। যদি বাংলা সনই হয়, তা'হলে বাঙাল মুলুক পার হয়ে এতদুরের পাঠান মুলুকে তার আগমন ঘটল কীভাবে? সমস্যা, বিরাট সমস্যা।
হোস্টেলের পাঠান বাবুর্চি ফুল শা' মাসিক পাঁচ টাকা চুক্তিতে আমার কাপড় কেঁচে দিয়ে যায়। সে জ্ঞান দিল - তার মা'দাদীরাও নাকি বাঙালদের মতোই বৈছাখ, জেঠ, আস্ষাঢ় এইসব দিয়ে মাস গননা করে!
লে হালুয়া, বাংলা সন বেমালুম সর্বভারতীয় হয়ে গেল!
কিন্তু কীভাবে?
ছোটবেলায় কবিতায় পড়েছিলাম- 'আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়, সিংহল নাম রেখে গেছে তার শৌর্য্যের পরিচয়'। সে না হয় হলো, আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের কোন এক বীর পুর্বপুরুষ শ্রীলংকা দেশটি জয় করে সেদেশের নাম রেখেছিল সিংহল। কিন্তু বাংলাদেশের কোন বীরপুরুষ কখনও সুদুর গান্ধারে (কান্দাহারের মহাভারতোক্ত নাম

গান্ধার। গান্ধারই কালপ্রবাহে কান্দাহার নাম ধারণ করেছে। কান্দাহার এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ একই ইথনিক বলয়ভুক্ত। সুযোগ মিলেছে যখন, পাঠককে আরও একটু জ্ঞান দেই। ষাটের দশকে জেনারেল আইয়ুব খান আমেরিকার জেনারেল মোটর্স কারখানাটি অধিগ্রহন করে নাম রেখেছিলেন গান্ধার ইন্ডাষ্ট্রিজ। উল্লেখ্য, দুর্যোধনের মাতৃদেবীর নাম ছিল গান্ধারি। তিনি ছিলেন কান্দাহার তথা গান্ধ্যারের মেয়ে! গান্ধার দুহিতা, তাই নাম গান্ধারি) অভিযান চালিয়েছিল এবং সেই দেশটি জয় করে আমাদের সনতারিখ সেদেশে রোপন করেছিল, এমত কাহিনী ইতিহাসে নাই। ইতিহাস বরং উল্টো সাক্ষীই দেয়। খিলজি থেকে শুরু করে লোধি, খাঁন সবাই গান্ধার এলাকা থেকে এসে বাংলার নরম পলিমাটিতে ঘাটি গেড়েছিল। বাঙালি রমনী শাদি করে বংশবিস্তার করেছে এখানেই। সঙ্গত কারণেই তাদের সংস্কৃতি কিছুটা হলেও আমাদের ভাষা-সংস্কৃতিতে থাবা রেখে গেছে। আমাদের সংস্কৃতি তথা আমাদের সাল সীমান্ত প্রদেশ অবধি গেল কীভাবে! আমাদের পরদাদা প্রতিপালিত বৈশাখী অনুষ্ঠান সুদুর সীমান্ত প্রদেশে কীভাবে রফতানী হলো? শুধু সীমান্ত প্রদেশ? পাঞ্জাব, কাশ্মীর, এমনকি বিন্ধ পর্বত পার হয়ে সুদুর দক্ষিন ভারতেও বিছাখ, জেঠ, আ'ঢ়, শাওন, ভাদো, আশুন, কাত্তাক, মা'আঘাড়, পো'হ, মাঘ, ফাগুন ও চেত মাসগুলি প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করছে। 'ভ্যালা হলো দেখি ল্যাঠা'!

একটি গুরুতর প্রশ্ন হিসেবেই বিষযটি মনের জমীনে ঘুরপাক খেয়েছে এতকাল, সমাধানের নাগাল মেলেনি। দুই হাজার ছয় সালের নববর্ষে এসে পুরোনো প্রশ্নটি আবার নুতন করে চাগার দিয়ে উঠলো। ঢাকার বাঙালিরা দুই হাজার পাঁচ সালে বাংলা নববর্ষ পালন করলো ১৪ই এপ্রিল, বিষ্যুদবার। এলাহি কারবার, লাখ লাখ তরুন-তরুনী রমনার বটমুল ছাপিয়ে গোটা ঢাকার রাজপথ সয়লাব করে দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, সেদিন কলকাতার দাদারা এত চুপচাপ কেন? তিনারা পয়লা বৈশাখ নমো নমো করে পালন করলেন পরেরদিন- ১৫ই এপ্রিল। শুক্কুরবার! দুই হাজার ছয় সালেও সেই একই অবস্থা। ঢাকায় পয়লা বৈশাখ প্রতিপালিত হচ্ছে ১৪ই এপ্রিল, শুক্রবার। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাংলায় পয়লা বৈশাখ পালিত হচ্ছে রবিবার, ১৬ই এপ্রিল। পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সন আর বাংলাদেশের বাংলা সন কি তা'হলে এক সন নয়?

বিষয়টির উপর অবিশেষজ্ঞসুলভ তদন্ত করতে যেয়ে ইন্টারনেটের ভান্ডার থেকে ছিটেফোটা যেটুকু তথ্য বেরিয়ে এলো- পাঠককুলের কান ঝালাপালার জন্যে তা যথেষ্ট। নীম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যবিরণী পেশ করা গেলোঃ-

১। একদল পন্ডিত প্রমান করতে চেয়েছেন যে বঙ্গাব্দ বলে যে সনটি আমরা পালন করে থাকি- তার প্রবর্তক গৌড়রাজ শশাঙ্ক। সিংহাসনে আরোহনের দিন হতে তিনি এই সালের প্রবর্তন করেছেন বলে যুক্তি দেখান তারা। শশাঙ্কের রাজত্বকালের লিখিত বর্ণনা খুব একটা নেই। শিলালিপি হতে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় - বঙ্গদেশ, ওড়িশ্যা ও বিহারের কিয়দংশ জুড়ে তার রাজত্ব ছিল। তার রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটিতে এই প্রাচীন নগরীটি অবস্থিত ছিল)। শশাঙ্কের রাজত্বকাল ছিল সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে। এক শিলালিপি হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে তিনি ৬১৯ খৃষ্টাব্দে চিলকা হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে ৬১৯ সালে তিনি গৌরবের মধ্যভাগে ছিলেন এবং এর পুর্ববর্তী কোন এক সময়ে তিনি গৌড়ের রাজা হন। শশাঙ্ক যে তার সিংহাসনে আরোহনের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা সনের প্রবর্তন করে গেছেন তার কোন লিখিত প্রমান নেই। শশাঙ্ক ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন বলে ধারনা করা হয়। ঠিক এর পরের বছর (৬৩৮ খৃষ্টাব্দে) বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউ এন সাঙ

বাংলায় আসেন। হিউ এন সাঙের বর্ণনা থেকে তৎকালীন বাংলার অনেক বর্ণনা মেলে; যেমন তৎকালীন বঙ্গদেশকে তিনি পাচটি ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা দিয়েছেন– যথা কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিম বঙ্গ), সমতট (পুর্ব বঙ্গ), পুন্ড্রবর্ধণ (উত্তর বঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর) ইত্যাদি। কিন্তু শশাঙ্ক যে একটি নুতন সাল চালু করেছিলেন এমন তথ্য হিউ এন সাঙের বর্ণনায় নাই। শশাঙ্ক যদি তার সিংহাসনে আরোহনের দিনটি থেকেই বঙ্গাব্দের প্রচলন করে থাকেন, তবে তার সিংহাসনে আরোহনের সালটি হতে হয় ৫৯৩ খৃষ্টাব্দ (২০০৬–১৪১৩=৫৯৩)। এই সময়ে প্রাগজ্যোতিষের (আসাম অঞ্চলের প্রাচীন নাম) রাজা ছিলেন ভাস্করবর্মা; তিনি ভাস্করাব্দ নামে একটি নুতন সালের প্রবর্তন করেছিলেন যা আজ পর্য্যন্ত আসাম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। হিউ এন সাঙের বর্ণনায় ভাস্করাব্দের বর্ণনা আছে, কিন্তু বঙ্গাব্দ কিংবা শশাঙ্কাব্দের বর্ণনা নাই। শশাঙ্কই বঙ্গাব্দের প্রচলন করে গেছেন– এই থিওরির আরেকটি মারাত্মক ছিদ্র রয়েছে। শশাঙ্ক গৌড়রাজ্যের রাজা ছিলেন, তার রাজত্ব পুর্বভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল, সারা ভারতবর্ষব্যাপী ছিল না। তা'হলে তার প্রবর্তিত সালটি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল কীভাবে? বাংলা-বিহার-উড়িশ্যার নরপতির প্রভাব সুদুর পেশাওয়ার, কাশ্মির কিংবা দাক্ষিনাত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল– এমনটি মেনে নেয়া কষ্টকর।

২। আরেকদল বিশেষজ্ঞ প্রমান করেছেন– বাংলা পঞ্জিকা বলে যেটাকে আমরা মানি– এর প্রবর্তক দিল্লীর সম্রাট আকবর। রাজকাজের সুবিধার্থে প্রচলিত চান্দ্র সালের (হিজরি) পরিবর্তে "তারিখ-ই-ইলাহি" নামের একটি সৌর সালের প্রবর্তন করেন তিনি। হিজরি সাল চন্দ্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এর মাসগুলি স্থির থাকে না। ঈদ কখনও শীতকালে হয়, কখনও বা গ্রীষ্মকালে। সতত পরিবর্তনশীল একটি ক্যালেন্ডারের উপর ভরসা করে আর যাই হোক রাজকার্য্য চলে না। ধরা যাক মহররমের ১ তারিখে একজনের খাজনা দেয়ার তারিখ। দিনটি বৈশাখ-জৈষ্ঠের শস্যমৌসুমেও পড়তে পারে, আবার আশ্বিনকার্তিকের আকাল মৌসুমেও পড়তে পারে। সুতরাং খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্যে একটি সৌর সালের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন মহামতি আকবর এবং জ্ঞানীগুনীদের দিয়ে তারিখ-ই-ইলাহি নামক সৌর ক্যালেন্ডারের সুচনা করেছিলেন। এজন্যে কেউ কেউ একে 'ফসলি সন' বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। আকবরের সভাসদ বিখ্যাত আবুল ফজল রচিত 'আকবর নামা' গ্রন্থে এই সাল প্রচলনের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। হিজরির পরিবর্তে এই নুতন সাল যাতে রাজ্যের সর্বত্র অনুসরণ করা হয় সে জন্য একটি রাজকীয় ফরমান জারি করেন আকবর। আবুল ফজলের গ্রন্থে সেই রাজকীয় ফরমানটিরও হুবহু উল্লেখ রয়েছে। হিজরি সালের সাথে সমন্বয় করে এই নুতন সালটি নির্মান করেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতেউল্লাহ (তার রাজকীয় টাইটেল ছিল আজাদ-উদ-দ্দৌলা)।

আবুল ফজলের বর্ণনামতে– রাজকীয় ফরমানটি জারী করা হয় ৯৯২ হিজরিতে (১৫৮৪ খ্রীঃ), তবে এর ইফেক্ট দেয়া হয় আকবরের সিংহাসনে আরোহনের দিন হতে। স্মর্তব্য– ৯৬৩ হিজরি সালের ১০ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ১৬ই মার্চ ১৫৫৬ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাক্রমশালী হিমুকে পরাজিত করে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন এবং সেই ঘটনাটিকে স্মরনীয় করে রাখতে তারিখে ইলাহি ক্যালেন্ডারের দিন গননা উক্ত দিন হতে শুরু হয়। আদেশ জারী করা হয় যেন এখন হতে সমুদয় রাজকীয় কার্য্যাদিতে উক্ত নুতন ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা হয়।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৯৬৩ হিজরি সালে (১৫৫৬ খ্রীঃ), সৌর হিসেব মোতাবেক ৪৫০ বছর পুর্বে (২০০৬–১৫৫৬=৪৪৯)। ৯৬৩ হিজরি সালকে বেইজ ধরে সৌর সাল গননা করে আসলে বর্তমানে তারিখে ইলাহি সনের আয়ু হয় ১৪১৩ বছর

(৯৬৩+৪৫০=১৪১৩), বর্তমানে আমরা যে বাংলা সনটি অনুসরণ করছি তার সাথে তা পুরোপুরি সঙ্গতিপুর্ণ।
আগেই বলা হয়েছে, আকবর শুধু নুতন সালটির প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, রাজ্যের সর্বত্র যাতে তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় সেই মর্মে কড়া আদেশ জারী করেন তিনি। প্রবর্তিত নুতন সালের প্রথম দিনটিতে নববর্ষ বা নওরোজ উৎসবের সুচনা করেন যা তার রাজ্যের সর্বত্র উৎসাহভরে প্রতিপালিত হতো। এরুপ একটি নওরোজ উৎসবেই শাহযাদা সেলিমের সঙ্গে মেহেরুন্নিসার কিংবা শাহযাদা শাহজাহানের সঙ্গে মমতাজ মহলের চারচোখের মিলন ঘটেছিল এবং সুত্রপাত হয়েছিল রাজকীয় প্রেম-অধ্যায়ের - যার ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি 'জগত-আলো নুরজাহানকে' কিংবা 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল' বিশ্ববিখ্যাত তাজমহলকে। আকবর আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী তার রাজ্যে অসাম্প্রদায়িক উৎসব হিসেবে যে নববর্ষ উৎসবটির সুচনা করেন, সীমান্ত থেকে বাংলা আর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারি পর্য্যন্ত আজতক তা প্রচলিত আছে। আমার পাঠান বাবুর্চি ফুল শা কেন জশনে হাজারা উৎসব পালন করে এবং সেই একই দিনে কেন বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে বৈশাখী মেলা বসে- তার কারণ অনুধাবন করতে পাঠকের এখনও বাকী আছে কী?

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় আলোচনা না করলেই নয়। আকবর প্রবর্তিত তারিখে ইলাহি সনের মাসগুলির নাম কিন্তু বৈশাখ-জৈষ্ঠ-আষাঢ় এরুপ ছিল না। তারিখে ইলাহির মাসগুলির নাম হচ্ছে যথাক্রমে কানওয়াদিন, আর্দি, ভিহিশু, খোরদাদ, তীইর, আমার্দাদ, শাহরিয়ার, আবান, আযুর, দাইই, বাহাম, এবং ইস্কান্দার মিয (Kanwadin, Ardi, Vihisu, Khordad, Teer, Amardad, Shahriar, Aban, Azur, Dai, Baham, Iskander Miz)। সুত্রঃ অরিজিন অব বেঙ্গালি নিউ ইয়ার- লেখক-সৈয়দ আশরাফ আলী। নামগুলি দেখলে মনে হয়- সেগুলি স্পষ্টতই ফার্সি তথা ইরানী ক্যালেন্ডার থেকে ধার করা। আকবর ফার্সিভাষী ছিলেন, তার দরবারের রাজভাষাও ছিল ফার্সি। সুতরাং তার প্রবর্তিত অব্দের মাসগুলির নাম তিনি ফার্সিতে রাখবেন- এটাই স্বাভাবিক। তবে উপরে বর্ণিত নামগুলির সাথে ফার্সি ক্যালেন্ডারের নামের সামান্য গড়মিল রয়েছে। পাঠকের বিবেচনার জন্যে তিনযুগের (প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক) ফার্সি নাম নীম্নে প্রদত্ত হলোঃ

Table: Iranian Calendar Months & Seasons.

Order	Avestan (A.D.C. –2000 to –300)	Middle Persian (A.D.c. –300 to + 700)	Modern Persian	Days	Seasons
1	Fravashi/Fravarti [Devine essence]	Frawardin	Farvardin	31	Spring
2	Asha Vahishta [Best righteousness]	Ardawahisht	Ordibehesht	31	Spring
3	Haurvatat [Wholeness, integrity]	Khordad	Khordad	31	Spring
4	Tishtrya Sirius, rain star]	Tir	Tir	31	Summer
5	Amereta [Immortality]	Amurdad	Mordad/ Amordad	31	Summer
6	Khshathra Vairya [The good dominion of choice]	Shahrewar	Shahrivar	31	Summer
7	Mithra [Sun, friendship, promise]	Mihr	Mehr	30	Autumn

8	Ap [Water]	Aban	Aban	30	Autumn
9	Athra [Fire]	Adur	Azar	30	Autumn
10	Dathusho [Creator]	Day	Dey	30	Winter
11	Vohu Manah [Good mind]	Wahman	Bahman	30	Winter
12	Spenta Armaiti [Holy serenity]	Spandarmad	Esfand	29 (leap year =30)	Winter

সে যাই হোক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আকবর তারিখে ইলাহি মাসগুলির নামকরণ করেছিলেন তার মাতৃভাষা ফার্সির অনুকরণে। অথচ বঙ্গাব্দের মাসগুলির নামকরণ করা হয়েছে নক্ষত্রের নামে (যেমন বিশাখা নক্ষত্রের নামে বৈশাখ, জেষ্ঠার নামে জৈষ্ঠ, আষাঢ় থেকে আষাঢ়, শ্রাবনী থেকে শ্রাবন, ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, অগ্রাহায়নী থেকে অগ্রাহায়ন, পৌষা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফাল্গুনি থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র)। আকবর প্রচলিত তারিখে ইলাহির মাসগুলি কখন কীভাবে নক্ষত্রের নামে রূপান্তরিত হলো– এ প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না!

এ প্রসঙ্গে একটি সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা (এ্যাষ্ট্রনমি) বেশ প্রসার লাভ করেছিল। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই ভারতীয় ঋষিরা নক্ষত্রদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষন করে এসেছেন এবং আর্য ভাষায় তাদের নামকরণ করেছেন। একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে আকবরের হাজার বছর আগে থেকেই ভারতবাসীরা মাসগুলিকে নক্ষত্রের নামের সাথে মিলিয়ে ডেকে এসেছে। শকাব্দ নামক যে ক্যালেন্ডারটি বর্তমানে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, এর মাসগুলির নামও বৈশাখ জৈষ্ঠ ইত্যাদি। শকরাজ শালীবাহন এই সালের প্রবর্তক। ৭৮ খৃষ্টাব্দকে জিরো ধরে শকাব্দের গননা শুরু, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সাল হতে ৭৮ বছর বিয়োগ করলে শকাব্দ পাওয়া যায়। সে হিসেবে এখন এখন ১৯২৮ শকাব্দ চলছে। অর্থাৎ– শকাব্দের বয়স তারিখে ইলাহি তথা বঙ্গাব্দের চেয়ে প্রায় ৫১৫ বছর বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে– তারিখে ইলাহির বহু আগে থেকেই ভারতবাসীরা মাসগুলিকে বৈশাখ, জৈষ্ঠ ইত্যাদি নামে ডেকে এসেছে। তারিখে ইলাহির খটমটে নামগুলি হয়তো লোকজভাবেই প্রচলিত নামের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে। আকবরের তারিখে ইলাহির মাসগুলি যদি লোকমুখে প্রচলিত মাসগুলির সাথে মিশে যেয়ে থাকে এবং রাজকীয় ফরমানের বলে ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে যেয়ে থাকে– আশ্চর্য্যের কিছু নেই। এমন মিশ্রন ভারতবর্ষে বহু ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ কি আর সাধে বলেছেন– “হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন/ শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন”। সুতরাং শক বংশোদ্ভুত শালিবাহন আর মোঙ্গলপুত্র আকবর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে আশ্চর্যের কিছু নেই। (সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে বলে রাখা দরকার যে মোঁগলদের মতো শকেরাও কিন্তু ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী নয়। শক গোত্র মোঁগলদের মতোই মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর গোত্র)।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট্ট বিষয় আলোচনা করা জরুরী। এই গ্রহে বাঙালি জনগোষ্ঠির মুল আবাসস্থল বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে। এই দু’ জায়গার অধিবাসীরাই মুলতঃ বাংলা ক্যালেন্ডার ফলো করে থাকে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে দুই বাংলায় একদিনে বাংলা নববর্ষ পালিত হয় না। আগেই বলা হয়েছে– এ বছর (১৪১৩ বঙ্গাব্দে) ঢাকায় ১লা বৈশাখ উদযাপিত হয়েছে ১৪ই এপ্রিল, কলকাতায় ১৬ই এপ্রিল। পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সন আর পুর্ব বঙ্গের বাংলা সন কি তা’হলে এক সন নয়– আমার এই প্রশ্নের জবাবে শাহ-সাহেব

(শাহ আব্দুল মজিদ, বদরগঞ্জের ইতিহাস, রঙ্গপুরের ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থের প্রনেতা) যে ফর্মুলা দিলেন- পাঠকের বিবেচনার জন্যে তা পেশ করছি। তিনি বললেন- ষাট দশকের আগে পুর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা একই বাংলা ক্যালেন্ডার ফলো করত। লোকনাথ পঞ্জিকা, মদনমোহন বসাকের পঞ্জিকা ইত্যাদি নানা মোড়কে বাংলা ক্যালেন্ডার উভয় বাংলার ঘরে ঘরে শোভা পেত। তখন চৈত্র সংক্রান্তি কিংবা পহেলা বৈশাখের দিনগুলি উভয় বাংলায় একই দিন প্রতিপালিত হতো। বাংলা ক্যালেন্ডারের দিনগুলি সুষম ছিল না; কোন মাস ৩২ দিনে, কোন মাস ৩১ দিনে, কোন মাস ৩০ দিনে, আবার কোন মাস ২৯ দিনে ছিল। এই আসমতা দুর করতে বাংলা একাডেমি উপমহাদেশের বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী জ্ঞানতাপস ডঃ মোহম্মদ শহীদুল্লাহকে দায়িত্ব দেন। বহু গবেষণা করে ডঃ শহীদুল্লাহ প্রচলিত ক্যালেন্ডারের সংস্কার করেন এবং মাসগুলিকে নুতনভাবে বিন্যস্ত করেনঃ

বৈশাখ থেকে ভাদ্র – ৫ মাস – প্রতিমাস ৩১ দিন = ১৫৫ দিন।

আশ্বিন থেকে চৈত্র – ৭ মাস – প্রতিমাস ৩০ দিন = ২১০ দিন।

লীপ ইয়ার বা অধিবর্ষের ফাল্গুন মাসে ১ দিন যোগ করা হয়।

বাংলা একাডেমির এই সংস্কারকৃত পঞ্জিকা তখন হতেই পুর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে অনুসরণ করা হতে থাকে; পক্ষান্তরে পশ্চিম বঙ্গবাসীরা পুরাতন পঞ্জিকাই অনুসরণ করে যান। ফলশ্রুতিতে বৈশাখ প্রতিপালনে দুই বাংলায় দুই এক দিনের এই গড়মিলের সুচনা হয়েছে।

তবে আসল কথা – সালটি আকবরই প্রচলিত করুক আর শশাঙ্কই প্রচলিত করুক- আমাদের দাদাদাদী, পরদাদা পরদাদী- সকলেই হাজার বছর ধরে এই সালেই তাদের দিনতারিখের হিসেব রেখে এসেছেন। গ্রামের কৃষকের ছেলেটি মা'র গলা জড়িয়ে ধরে যখন জিজ্ঞেস করে- মা, আমার জন্মদিন কবে- মা হেসে উত্তর দেন- 'তুই ফাগুন মাসে হইছস্, সোমবারে'। কিংবা হয়তো বলেন- 'তুই হইছস চৈত্ মাসে, গেদী হইছে আঘন মাসে'। গ্রামবাংলার আবহমান জনগোষ্ঠি জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী বুঝে না, তারা কার্তিকের আকাল বুঝে, অঘ্রানের নবান্ন বুঝে, চৈত্-বৈশাখের কালবোশেখি বুঝে, শ্রাবনের প্লাবন বুঝে। এই বোধ কোন ধর্মীয় বোধ নয়, কোন হিন্দু ধর্ম কোন বৌদ্ধ ধর্ম বা কোন ইসলাম ধর্ম এই বোধ তাদের মনে প্রোথিত করেনি। এ নেহায়েতই এক ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক বোধ, মায়ের নাড়ী হতে জন্মগতভাবে এই বোধ সঞ্চারিত হয় তাদের মনে। অথচ পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত একটি সাংস্কৃতিক বোধকে যখন ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে তার উপর বোমাপিস্তল নিয়ে হামলা চালানো হয়, ধর্মের নাম করে নিরীহ নির্দোষ জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় (রমনার বটমুলে বোমা হামলা)- মন বিষাদে ভরে উঠে। মনে প্রশ্ন জাগে- যাকে আমরা শান্তির ধর্ম বলে জেনে এসেছি এতকাল, সে ধর্ম কি এতটাই নিষ্ঠুর? দেশজ সংস্কৃতির সাথে কি তার এতটাই বিরোধ? এ কি ধর্ম, না ধর্মের অপব্যখ্যা? ধর্মের নামে স্বৈরাচার? ধর্ম কি কখনও আনন্দপিাসু জনগণের রক্ত ঝরানোর শিক্ষা দিতে পারে? আমাদের রাসুল ধর্ম প্রচার করেছেন, কিন্তু তিনি কি শ্বশ্বাত আরব সংস্কৃতিকে অস্বীকার করেছেন? তিনি পৌত্তলিকতাকে নিরুৎসাহিত করেছেন, কিন্তু বিশেষ বিশেষ আনন্দের মুহুর্তে আরব রমনীরা সমবেত কণ্ঠে উলুধ্বনি দিয়ে উঠে, হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালায়। হাজার বছরের সেই সাংস্কৃতিক প্রথা তো রাসুল উচ্ছেদ করেননি। কাবা ঘর হতে তিনি লাত-মানাতকে দুরীভুত করেছেন, কিন্তু আরবদের সাংস্কৃতিক প্রথা হিসেবে হাজার বছর ধরে প্রতিপালিত হজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়ার রীতি তো তিনি বাতিল করেননি। তিনি অশ্লীল নৃত্যগীতিকে নিরুৎসাহিত করেছেন, কিন্তু দফ্ বা ঢোল বাজিয়ে নির্দোষ আমোদপ্রমোদে বাধা দেননি, বরং উৎসাহ সহকারে তা উপভোগ করেছেন। তিনি মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু হাজার বছর ধরে চলে আসা ওকাজের বাৎসরিক মেলা নিষিদ্ধ করেননি, নিষিদ্ধ করেননি সেই মেলায় চলে আসা আরবদের ঐতিহ্যবাহী কবির লড়াই, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগীতা

(ঘোড়দৌড়ের উপর বাজী ধরা নয়) কিংবা অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। বরং পৌত্তলিক যুগের অনেক প্রথাকেই তিনি কিছুটা সংস্কার করে তার নিজের ধর্মের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। (উদাহরণস্বরূপ আমরা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জ্ব অনুষ্ঠানটির কথাই বিবেচনা করতে পারি। এই প্রথাটি ইসলামপুর্ব আমল থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র পৌত্তলিকরাই এই প্রথাটি পালন করত। আরবদেশে বসবাসরত ইহুদি-খৃষ্টানরা কখনই এই প্রথা পালন করত না, এখনও করে না। পৌত্তলিকরা তিন শ' ষাটটি মুর্তির গর্ভগৃহ কাবায় প্রতিবছর হজ্জ্ব করতে আসত। তারা কাবা ঘর তাওয়াফ করত, সাফা-মারোয়ায় সাঈ করতো, হজরে আসওয়াদে চুমো খেত, পশু কোরবানী করতো, অতঃপর মস্তক-মুন্ডন করতঃ নিজ নিজ দেশে ফিরে যেত। রাসুল পৌত্তলিক যুগের সেই প্রথাটিকে উচ্ছেদ করেননি, বরং তাকে কিছুটা সংস্কার করে তার ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে প্রতিস্থাপন করে গেছেন)।
এসব বিবেচনা করে আমরা হয়তো সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে আসলে দেশজ সংস্কৃতির সাথে ধর্মের কোন বিরোধ নেই। বিরোধ যেটিকে আমরা পাকিয়ে তুলছি, তা নেহায়েত ধর্মের অপব্যখ্যা, ধর্মের মুল সুর বা তার স্পিরিটকে অনুধাবন করায় আমাদের ব্যর্থতা।

ধর্মের ধ্বজাধারী এইসব দুবৃত্তদের কথা মনে হলে নিতান্ত অ-কবির বুকেও তাই ঘৃনার বিষ ছন্দায়িত হয়ে উঠেঃ

“এমন কেন হয় না আহা, সাগর কেন গর্জে না
আকাশ ভেঙে বজ্র কেন তাদের মাথায় বর্ষে না?
লক্ষকোটি প্রাণের ঘৃনায় উথলে উঠুক সবার বুক
ঘৃনার মাঝে নিত্য সেথায় চিলশকুনের কবর হোক”।

মেজবাহউদ্দিন জওহের
বৈশাখ- ১৪১৩ সাল।